International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক

ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

লোকসংস্কৃতির শিকড় সন্ধানে লোকনাট্য লেটো

অঙ্কিতা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষের জীবনচর্চা ও চর্যার সমন্বিত রূপই সংস্কৃতি অর্থাৎ একটি জাতি তথা একটি সম্প্রদায় বা একটি জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের প্রচলিত ভাবধারা যা তাদের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকলাপ গুলি সমাজ গঠনের একমাত্র উপাদান হয়ে ওঠে। এই সংস্কৃতিই হলো আমাদের সমাজ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে জড়িয়ে থাকা যে বিষয়গুলি পরম্পরায় আবহমানকাল ধরে টিকে রয়েছে তার সবকিছুই লোকসংস্কৃতির উপাদান। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতিই বঙ্গসংস্কৃতির প্রধান ধারা। বাংলার লোকসংস্কৃতি বঙ্গজনপদবাসীর যৌথ জীবন চর্চার এক আন্তরিক ভাষ্য। সমন্বয়, সহাবস্থান ও সৌহার্দ্রের এক অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় লোকসংস্কৃতিতে। এক এজটি জাতির জীবননির্বাহের জন্য আলাদা আলাদা সংস্কৃতির আবর্তন ও বিকাশ ঘটে। মানুষের জীবনের বিকাশ ঘটাতে এবং জনজীবনের সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটাতে সংস্কৃতিকে আধার হিসেবে ধরে নিয়ে আবহমানকাল ধরে প্রবহমান বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত এবং স্বকীয়তা বজায় রেখে বিবর্তনের গতিতে এগিয়ে চলেছে। সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ স্পষ্ট বলেই মানুষের জীবনচর্চা পরিশীলিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী সম্পদকে রক্ষা করে চলেছে তাদের দৈনন্দিন উপাদানগুলির মধ্যে দিয়ে। লোকসংস্কৃতির আঙিনায় মানবসভ্যতা নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। লোকসংস্কৃতি 'লোক' হল সাধারণ মানুষ যার সার্বিক জীবনায়ন জীবন যন্ত্রনায় সম্পৃক্ত বাহুল্যবর্জিত অতিসাধারণ অর্থাৎ কৃষি নির্ভর মানুষগুলোর জীবন যন্ত্রণার নানা ছন্দই লোকসংস্কৃতির পটভূমি যার অঙ্গ হিসেবে লোকউৎসব, লোকপার্বণ, লোকাচার, লোকনাট্য, লোকসংগীত, লোকসংস্কার প্রভৃতি উপাদান গুলি জড়িয়ে রয়েছে। সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লোকসংস্কৃতির শাখা-প্রশাখা গুলিও বিকাশলাভ করেছে। লোকসংস্কৃতি কথাটি সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমেদ স্পষ্ট করেই বলেছেন—

লোকসংস্কৃতি মননশীল নয়। এতে স্বভাব ও প্রবৃত্তির ছাপ বেশি পড়ে। এজন্য লোকসংস্কৃতি অকৃত্রিম। সরলতা ও স্বাভাবিকতা লোকসংস্কৃতির ভূষণ।

জনসাধারণের অক্ষর জ্ঞান নেই বলে তাঁরা কোন কিছু গ্রন্থিবদ্ধ বা নথিবদ্ধ করে রাখে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লোকজ্ঞানের প্রধান উৎস। লোক মুখে তা প্রচারিত হয়। লোকশ্রুতিতে গৃহীত ও লোকসংস্কৃতিতে রক্ষিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব তথা জাতিতত্ত্বের প্রকৃত উপাদান লোকসংস্কৃতিতে প্রবহমান থাকে। সুতরাং একটি দেশের একটি জাতির মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পরিচয় তার লোকসংস্কৃতির দ্বারাই সম্ভব।[১]

এখান থেকে বোঝায় যাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ লোকমুখে লোকের দ্বারা প্রচারিত সংস্কৃতি। লোকায়ত শিকড় থেকে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বিভিন্ন রকমের সংস্কৃতি যা সমাজের মানুষদের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিব্যাপ্ত। লোকসংস্কৃতির 'লোক' শব্দটি যথার্থ অর্থবহন করে। এই শব্দের দ্বারা গ্রাম্য পরিবেশে বসবাসকারী কৃষক বা জনসাধারণের দৈহিক ও সাংস্কৃতিক কিছু বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের ধারায় তাদের মধ্যে বর্তমান। সভ্যতা সৃষ্টির সময় থেকেই সংস্কৃতিও বিদ্যমান কিন্তু 'লোক' এর দ্বারা সংস্কৃতি যেন এক অন্যমাত্রায় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত। লোকসংস্কৃতি বাঙালি জীবনের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার নিদর্শন। মুখে মুখে প্রচারিত অর্থাৎ মৌখিক ধারার লোকসাহিত্যগুলি লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। ঠিক তেমনই লোকনাট্য গদ্যে ও পদ্যে রচিত একটি বিশিষ্ট মৌখিক ধারার সাহিত্য। লোকনাট্য সম্পর্কে অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন—

লোকেদের দ্বারা রচিত, অভিনীত এবং লোকেদের সম্মুখে পরিবেশিত নাটককেই লোকনাট্য বলে।[২] অর্থাৎ লোকের দ্বারা বা ব্যক্তির দ্বারা গল্পকাঠামো তৈরি হয়ে অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, বাদ্যকার প্রমুখদের আঙ্গিক বৈচিত্রের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়া মধ্যে দিয়ে লোকনাট্য রূপলাভ করে।

যেদিন থেকেই মানুষ হাতিয়ার বানাতে শুরু করেছে এবং প্রাথমিক যন্ত্র আবিস্কারের পথে এক পা ফেলেছে ঠিক সেই সময়েই মানুষ নিজেকে শিল্পীরূপে নানা ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলেছে। মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি চিরকালের বরং তা যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত। আলোচ্য গবেষণা পত্রে লোকসংস্কৃতির শিকড় হিসেবে মানব সভ্যতার সৃষ্টির সময় থেকেই ধরে নিয়ে তার মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতিকে স্থান করে নিয়েছে মানবজীবন। এখন লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকনট্যের শিকড় খুঁজতে গেলে আমাদের খ্রিষ্ট্রীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে ফিরে যেতে হয়। সেই সময় লোকনাট্যের বেশ চর্চা ছিল। গ্রাম্য সমাজে কোনো সংস্কার, আচার বা দেবতার

উদ্দেশ্যে গ্রাম্য মানুষজনের গীত, বাদ্য, সাজসজ্জা, নৃত্য পরিবেশিত হত।

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একবিংশ শতাব্দীতেও সেই একই ধারা বয়ে চলেছে। প্রাচীনকালে লোকনাট্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য, আখ্যান, সাজসজ্জার যে সমাবেশ ছিল আজও তা কোনো অংশে কম নয়। এমনকি আমরা ইতিহাস খুঁজলে পাই যে, প্রাচীনকালে মানুষ দৈহিক শ্রমকে হাতিয়ার করে এক মুঠো খাবার সংগ্রহ করেছে। এই শ্রম যাতে তাদের দৈহিক শক্তিকে এবং মনোবলকে ভেঙে না দেয় সেইজন্য তারা শ্রমকে ভুলে থাকবার জন্য বা শ্রমকে লঘু করবার উপায় হিসেবে বেছে নিত নৃত্য-গীত-সাজসজ্জার মতো এক ধরণের অভিনয়ের মাধ্যমকে। এই সাধারণ লোকেদের এমনকি সমাজের একেবারে নিচে থেকে উঠে আসা মানুষদের দ্বারা সৃষ্ট এবং অলিখিত যা লৌকিক জীবনের এক বিনোদন এবং বলাই যায় নিরক্ষর মানুষের কাছে তা আনন্দের খোরাক হিসেবে ধরা দিয়েছে। লোকসংস্কৃতিবিদ গোর্কির ভাষায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়—é‘The true history of the tailing people cannot be learnt without a knowledge of the folklore’.[৩]

লোকনাট্যের উদ্ভব প্রসঙ্গে নান বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, অনেকের মতে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে লোকনাট্যের উল্লেখ থাকায় লোকনাট্যের উদ্ভব প্রসঙ্গে ওই সময়কে বেছে নিতে চান। অজিতকুমার ঘোষ লোকনাট্যের উদ্ভবের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন—

আদিম মানবগোষ্ঠী আনন্দ অথবা দুঃখের ভাব প্রকাশ করত সম্মিলিত নৃত্যের মাধ্যমে। সৃষ্টির আদিতম চারু শিল্পকলা হল নৃত্য। কিন্তু নৃত্যের জন্য বাদ্যের প্রয়োজন। মানুষের দ্বারা নিহত পশুদের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকেই বাদ্যযন্ত্র নির্মিত হত। চর্ম থেকে নির্মিত হত চর্মবাদ্য, শৃঙ্গ থেকে বানানো হত শিঙা এবং অস্ত্র থেকে তৈরি করা হত চর্মবাদ্য। প্রথমে ভাব প্রকাশক কতকগুলি ধ্বনি নৃত্যের সঙ্গে উচ্চারিত হত। তারপর অর্থবহ ভাষার সৃষ্টি হলে তার সঙ্গে সুর সংযোগ করে সংগীত সৃষ্টি করা হল। এই নৃত্য ও সংগীতই হল লোকনাট্যের প্রধান উপাদান। নৃত্য ও সংগীতের সঙ্গে অনুকরণমূলক কৌতুক রসাত্মক অঙ্গভঙ্গি যুক্ত হত। সব শেষে এল কথা। মাঝে মাঝে স্বল্পভাবে। তারপর লোকনাট্যের বিবর্তনের কথা বাড়তে লাগল, কথার পাত্রপাত্রীও বাড়তে লাগল। সেই কথা যখন কাহিনীরূপে সুসংবদ্ধ হল তখনই জন্ম নিল নাটক। কিন্তু লোকনাট্যের কাহিনী এলেও সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রাধান্যই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।[৪]

সুতরাং এই উক্তি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে লোকনাট্যের উদ্ভব মানব সভ্যতার সূচনা লগ্নের সঙ্গে সঙ্গেই র বিষয়ে আর কোনো দ্বিধা নেই।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অঞ্চল গুলিতে বিভিন্ন রকমের লোকনাট্য দেখা যায়, অনুরূপভাবে ভারতেরও বিভিন্ন অঞ্চলে লোকনাট্যের নানান রীতি ও ধারা প্রচলিত আছে। দশম শতাব্দীতে আধুনিক ভাষাবংশের উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাট্যগুলিও ভাষা নির্ভর হয়ে বৈচিত্র দেখা দিল। বিভিন্ন অঞ্চলভেদে ভাষা, উপভাষা, বিভাষার দ্বারা লোকনাট্যের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দিল। তবে আধুনিক ভাষাগোষ্ঠীর অগে থেকেই লোকনাট্যের ধারা বজায় ছিল এবং তার ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। এ বিষয়ে অজিতকুমার ঘোষের বক্তব্য থেকে বিষয়টি পরিস্কার হয়।

সেই লোকনাট্যের ভাষা ছিল লোক প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা। তবে সেই প্রাকৃতেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত প্রচলিত লোকনাট্যের ধারায় আধুনিক ভাষারূপকে আশ্রয় করে বিবর্তিত হয়েছিল।৫

দেশের বিভিন্ন লোকনাট্যগুলির মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা লক্ষ্য করার মতো। সাধারণ লোকনাট্যের সূত্রপাত যেহেতু কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য পরিবেশে তাই তার অভিনয়ের পাত্রপাত্রীও গ্রাম থেকে উঠে আসা সহজ, সরল মানুষের প্রতিনিধি। নাটকে সংগীত, সংলাপ ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে কাহিনীতে গ্রাম্যজীবনেরই বিষয় মুখ্য হয়ে ওঠে এবং সত্য ঘটনায় তাদের ভিত্তি। গ্রাম্য শিকড় থেকে জন্ম নেওয়া মানুষদের অভিনয়ে কোনো কৃত্রিমতা থাকে না কোনো সাজসজ্জার বা পোশাক পরিচ্ছদও অতি নিম্ন গ্রাম্য মানুষদের মতো। এছাড়াও লোকনাট্যের যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে চোখে পড়ারমতো তা হল অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংলাপটুকু তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হতো আবার অনেক সময় তা মৌলিক আকারে দেখা যেত, সংলাপের কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যেত না। লোকনাট্যের অভিনয়ের জন্য কোনো মঞ্চ থাকতো না, সাজঘর থাকতো না বরং গ্রামের কনক খোলা মাঠে বা খোলা জায়গায় এর অভিনয় চলতো সারারাত ধরে। যেহেতু লোকনাট্যের উদ্ভব নিম্নবিত্ত, কৃষক, দিনাজপুর ও গ্রামের বেকার যুবকদের মনোরঞ্জনের একমাত্র উপায় অর্থাৎ গ্রাম্য মানুষজন সারাদিনের রোজগার সেরে ক্লান্ত শরীরকে একটু ক্লান্তিমুক্ত করতে নিজেরাই মুখে মুখে কিছু সংগীত, সংলাপ ও তার সাথে নৃত্য যোগ করে সারারাত ধরে অভিনয় করতো। এই অবিনয়ের ফলে তাদের একদিকে যেমন শরীরের অবসাদ দূর হতো তেমনি অন্যদিকে এই অভিনয়ের মধ্যে ফুটে উঠত তৎকালীন ঘটনার চিত্র, পুরানের কোনো ঘটনা,

রামায়ণ, মহাভারত থেকে উঠে আসা বেশকিছু ঘটনা। এই অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষজন রামায়ণ মহাভারতের বভিন্ন চরিত্র গুলি জানতে, বুঝতে এবং তাঁদের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে তুলনা করতে পারতো। এছাড়াও তৎকালীন জমিদারি প্রথা, সমাজের নানা কলহ, সংসারের অশান্তি, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিনয়ও দেখা যেত। এর ফলে মানব সভ্যতা সমাজের একেবারে মূল শিকড় থেকে উঠে আসা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পাশাপাশি লোকশিক্ষা দান ছিল লোকনাট্যের বিশিষ্ট উপাদান। লোকনাট্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে বিশেষ কোনো রচয়িতার ভাব পরিকল্পনার প্রাধান্য ছিল না, বিভিন্ন ঐতিহ্যগত ঘটনার সাক্ষীবহন করত লোকনাট্যগুলি। তৎকালীন লোকনাট্য যেটির দ্বারা অভিনয় আরও বেশি জনসমক্ষে প্রচারলাভ করত তা হল নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয়। এরমধ্য দিয়েই লোকনাট্যে রতি, শোক, হাস্য, উৎসাহ প্রভৃতি ভাবেই সমাবেশ ঘটত, লোকনাট্যের দর্শকমন্ডলী নাটকে অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে নিজেদের প্রতিফলিত দেখতে পেত এবং অভিনীত বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিতে সক্ষম হত। ফলত গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষজন লোকনাট্যের এই অভিনয় দেখে নিজেদের জ্ঞানচক্ষু খুলে যেত, বেশকিছু জ্ঞানলাভ করার সুযোগ পেত। এই কথাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ড. সঞ্জীব নাথ এর বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে হয়—

লোকসমাজ কতৃক লোকভষায় মৌখিক বা লেখ্যরূপে রচিত, অভিনীত, লোকসমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় লোকবেষ্টিত আসরে পরিবেশিত, স্বল্প চরিত্র ও নৃত্য-গীত-বাদ্য সমন্বিত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও শাস্ত্র নিরপেক্ষ ঐতিহ্যানুসারী বিষয়, অঙ্গসজ্জা, অভিনয় রীতি প্রকরণাদি অনুবর্তিত বা কালানুক্রমে পরিবর্তিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় লিকজীবন ও লোকমননকে প্রতিভসিত করে যে দৃশ্যকলা তাই লোকনাট্য।[৬]

লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য, পরিবেশন রীতি সবকিছুকে সামনে রেখে বলতেই হয় মানব সভ্যতার আদিযুগ থেকেই লোকনাট্যের চর্চা হয়ে আসছে এমনকি আদিযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে চলছে লোকনাট্য গুলি। মানবজীবনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে লোকনাট্যগুলি এবং বলাই যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত নাটককে পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে যায় লোকনাট্যগুলি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লোকনাট্যগুলি সক্রিয় ও প্রগতিশীল হয়ে উঠলো। তৎকালীন সময়ে যে যে লোকনাট্যগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত, তাদের বৈশিষ্ট্যও একে অন্যের থেকে আলাদা।

দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসে তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু লোকনাট্য এদেশে চলে আসে, যেমন উল্লেখযোগ্য 'অষ্টক' ও 'মনসার গান'। স্বাধীনতা পূর্বে ও স্বাধিনতার পরে বেশকিছু লোকপ্রিয় লোকনাট্য সমান মর্যাদায় অভিনীত হয়ে চলেছে তাদের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার 'বনবিবির পালা', উত্তর চব্বিশ পরগণার 'পুতুলনাচ' নদিয়ার 'বোলান, মালদহের 'গম্ভীরা', জলপাইগুড়ির 'পালাটিয়া', বর্ধমানের 'বাঘনাচ', বীরভূমের 'লেটো', কোচবিহারের 'কুশানপালা', মুর্শিদাবাদের 'আলকাপ', পুরুলিয়ার 'মাছানি' ইত্যাদি। লোকনাট্যগুলি দিনের পর দিন ধরে মানুষের চেষ্টায় তৈরি হয়েছে সুদীর্ঘকালের ফলস্বরূপ লোকনাট্যগুলি পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জায়গাতেই বিরাজমান এবং গ্রামবাংলার মানুষজন তা সাদরে গ্রহণ করেছে নিজেদের পরিচিতির অঙ্গ হিসেবে ও লোকসংস্কৃতির অংশ রূপে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই লোকনাট্যগুলির মধ্যে বীরভূম ও বর্ধমানের এক বিশিষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন লোকনাট্য হল লেটো। যা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নামে পরিচিতি। মুর্শিদাবাদে এটি আলকাপ নামে, বাঁকুড়াতে ভাঁড়যাত্রা নামে, হুগলিতে ঝাপসি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষভাবে লোকনাট্য লেটো আমাদের এই জনসমাজে সাধারণত সমাজের একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের মধ্যে এর উদ্ভব হয়, তার মধ্যে ছিল না কোনো ধর্মের ভেদাভেদ, সর্বসাধারণের জন্যএই লোকনাট্যটি উন্মুক্ত ছিল। বঙ্গসংস্কৃতির এক অন্যতম লোকনাট্য রাঢ় অঞ্চলের তথা বীরভূমের অতি পরিচিত লেটো। যা গ্রাম বাংলার মানুষের মুখে লোটো, নেটো লেটু নামে পরিচিত। 'লেটো' শব্দের অর্থ বোঝাতে মহম্মদ আয়যব হোসেনন বলেছেন—

লেটো শব্দের ভাব-অর্থ আমি যা বুঝেছি—তা হল গ্রাম্য পরিবেশে হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্যের অভিনয়।[৭]

অর্থাৎ এই লেটোগান বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ইত্যাদি অঞ্চলের গ্রামগুলিতে, মেলায়, খামারে, পুকুরের প্রান্তরে মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত এই গানের কলি। গ্রাম্য পরিবেশে বিশেষত হিন্দু সমাজের বাউরি, বাগদি, কাহার, কুমোর, মুচি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং একইসঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তাই বলতে দ্বিধা থাকে না লোকনাট্যের এই ধারাটি হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের লোকসমাজের মধ্যেই সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু উভয় ধর্মের লোকেদের গান গাওয়া বা অভিনয় করাই শুধু নয় এই অভিনয় দেখতে আসা

দর্শকদের মধ্যেও ধর্মের ভেদ ছিল না। অর্থাৎ ফাঁকা জায়গায় লেটোর অভিনয় দেখতে মিলল ঘটত উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের। লেটো শব্দের অর্থ রূপে সুকুমার সেনের বক্তব্যকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হয়।

'নৃতু' শব্দটির ব্যবহার ঋগ্বেদের পরে পাওয়া যায় নি। তবে মনে হয় কথ্য ভাষায় 'নুতু' শব্দে স্বার্থিক ক প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন 'নৃতুক' শব্দের ব্যবহার ছিল। কথ্য সংস্কৃতের এই সম্ভাব্য 'নৃতুক' থেকে 'নট্ট', 'নাটুঅ' শব্দের মধ্যে দিয়ে এসে বাংলায় 'নাটুয়া' ও আধুনিক বাংলায় 'নেটো', 'লেটো' রূপ পেয়েছে।[৮]

লেটোর শিকড়ের খোঁজ করতে গেলা জানা যায় কৃষিভিত্তিক সভ্যতার বিকলাশ লাভের জন্য অতি প্রাচীনকালে একদল গোপালক সূর্যের অয়ন গতিকে লক্ষ্য করে নদ-নদীর তীরে নিজের বসতি স্থাপন করার জন্য তৎপর হয়েছিল এবং তারা রাঢ় অঞ্চলের বিশেষত বীরভূম, বর্ধমানের অজয়-কুনুর-কোপাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে কৃষিকাজ করেছিল এবং তৎকালীন সময়ে সেই অঞ্চলগুলিতে কৃষিকাজকে একটা অন্যমাত্রা দিতে সক্ষম হয়েছিল নতুন বসতি স্থাপন করা গোপালক জাতি। তাদের কৃষিকাজের পাশাপাশি তারা নিজেরাই বিনোদনের জন্য নাচ-গানে মেতে উঠত। এই প্রসঙ্গে মহম্মদ আয়ুব হোসেন জানিয়েছেন—

বসতি স্থাপনের পর কৃষি ও তৎ-আনুষঙ্গিক কাজে ব্যাপৃত থাকলেও চিত্ত বিনোদনের জন্য তাদের একটা দল নৃত্যগীত ও অঙ্গভঙ্গি করে সাজসজ্জাসহ অভিনয় করতো। তাদের জীবনচর্যার ঘটনাবলী ছিল এ সবের বিষয়বস্তু। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এইসব নাট্যকর্ম ধীরে ধীরে পরিশীলিত হয়ে এক নবরূপ পরিগ্রহণ করে।[৯]

এই মন্তব্য থেকে ধরে নেওয়ায় যায় লেটোর উদ্ভব প্রসঙ্গটি। লোকনাট্যের একটি অতিসাধারণ বৈশিষ্ট্য তার উদ্ভব কৃষিভিত্তিক সমাজে। এখানে লেটোর উদ্ভব প্রসঙ্গটিও তাই, তার উদ্ভবটিও কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এর যে মূল উৎসভূমি সেটা সেই প্রাচীনকালে শুরু হয়ে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে অর্থাৎ বাংলার গ্রামে গত্রামে মানুষদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকনাট্যের এই পরিচিত বৈশিষ্ট্য থেকে লেটো কোনোভাবেই আলাদা নয়, এমনকি এসবের অনুশীলনের প্রচলন মৌর্য রাজত্বকালে রাজপুরুষদের মধ্যে 'বিহারযাত্রা'র পরিচয় পাওয়া যায় এবং তারা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাজপুরুষেরা রাজধানী পরিদর্শনে বেরোলে তাদের যাত্রাকালে হাতি, ঘোড়া, রথ, রন্ধনকারী এবং পথে মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ পটিয়সী পুরুষ ও নৃত্যগীতের সরঞ্জাম এবং সন্ধ্যার পর

কোনো কোনো সমাগমপূর্ণ জায়গায় তারা শিবির ফেলে নৃত্যগীতের ও কৌতুকপূর্ণ অভিনয়ের আয়োজন করত। সন্ধ্যা থেকে শুরু করে পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য তারা বিনোদনের উপায় নিজেরাই খুঁজে নিতে এবং তা চলত সারা রাত ধরে। এই নাট্যরীতিটি গ্রাম্য জনসাধারণের কাছেও অতি পরিচিতি ছিল বলেই তারাও এই অভিনয় দেখে যথেষ্ট আনন্দ পেত ও বেশকিছু শিক্ষা অর্জন করত। তারপর আস্তে আস্তে তারাও এই রীতিকে পারদর্শী হয়ে উঠলে তা গ্রাম গঞ্জে মানুষদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এমনকি গ্রাম বাংলার মানুষ বিনোদন বলতে একমাত্র এই হাস্য কৌতুকধর্মী রীতিকেই প্রধান উপজীব্য করে তোলে। তাই অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে মনের আবেগ, অনুভূতি সবই একান্ত হয়ে হয়ে থাকল। এই পরসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য যথেষ্ট কার্যকরী—

দু-হাজার আড়াই হাজার বছর ধরে যে বিশিষ্ট নাট্যরীতি আমাদের দেশে সাধারণ জনগণের রাজপণ্ডিত, ধনীর নয়-চিত্ত বিনোদন করে এসেছে তা কালবেশে ক্ষীণধারা ও লুপ্তপ্রায় হয়েও অদ্যাবধি প্রধানত মুসলমান নাটুয়াদের দ্বারাই রক্ষিত হয়েছে। এই হল বর্ধমান-বীরভূম-হুগলি জেলার শিক্ষিত জননিন্দিত ‘নেটো’ বা ‘লেটো’। ‘নেটো’র গান বা নাচ যাই বলুন এই হল প্রাচীন ভারতবর্ষের নাটকের অর্থাৎ নটকর্মের-সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচিত নয়—সাক্ষাৎ বংশধর, তবে কালান্তর ক্রমে যথোপযুক্ত রূপান্তর প্রান্ত।[১০]

অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের এই অতি প্রাচীন গ্রাম্য নাট্যরীতি যা শুধুমাত্র গ্রাম্য সমাজে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং জননিন্দিত অর্থাৎ এই লেটোগান শিক্ষিত সমাজের কাছে যথেষ্ট সুখকর রীতি না থাকায় ভদ্রসমাজে এর স্থান খুব একটা হয় না, এমন কি একে ‘ছ্যাচড়া’ গান বলেও আখ্যা দেওয়া হত।

লেটোগানের পরিবেশনের সময় ছিল শীতের শুরু থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ গ্রীষ্ম শুরুর মুহূর্ত অব্দি। লেটোগান বিভিন্ন মেলায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমনকি কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াও গাওয়া হত। এই গান দিনের আলোতে গাওয়ার কোনো রেওয়াজ ছিল না। সন্ধ্যা পেরিয়ে একটু রাতের দিকে বসত গানের আসর, অভিনয়ে অংশ নিত গ্রাম্য খেটে খাওয়া শ্রমজীবি মানুষ। অভিনয় বলতে তারা নিজেরাই নাচ, গান, সংলাপ, তৈরি করে নিত। এবং তা আসরে উপস্থাপন করত। তাদের সাজপোশাকেও কোনো বিলাসিতা ছিল না, দৈনন্দিন জীবনের পোশাকই অভিনয়ের সাজ। লেটোগান ও অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন লোকবাদএর ব্যবহার দেখা যেত, যেমন হারমোনিয়াম, ডুগি, বাঁয়া-তবলা, ফুলেট বাঁশি, কর্নেট বাঁশি, খঞ্জনি,

ঢোল, করতাল ইত্যাদি। লেটো গানের দলে যারা যারা অভিনয় করে তারা বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত। যেমন যেসব কিশোর যুবক মেয়ে সেজে অবিনয় করে তাদের সখী, ছোকরা, বাই বলে। যে হাস্যকৌতুকের নায়ক অর্থাৎ যার অভিনয় দেখে আসরে দর্শকরা একেবারে হাসিতে ফেটে পড়ে তাকে সংদার বা সংগেল বলা হয়। এই অভিনেতাদের মধ্যেই একজন থাকত যাকে ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত অভিনেতা বানানো হত, তিনিই অনেকসময় এমণ সংলাপ বলতেন যা হুল ফোটানোর মতো তাকে 'বেঙচি' নাম দেওয়া হত। এই বেঙচি অভিনেতার একদিন সংদার হয়ে উঠত। আসরে লেটো গান বা পালা শুরু হয় প্রথমে বন্দনা গীত দিয়ে। তারপর পালায় প্রবেশ করেন শিল্পীরা। সেই পালার মধ্যেই থাকে লেটোগান। এই লেটো শিল্পীরা যেহেতু সকলেই বাংলার মাটির সন্তান, অধিকাংশই নিরক্ষর, সারাদিনে নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়েই সেই লেটো গান ও সংলাপ মুখস্থ ও অনুশীলন করত তারা। মুসলিম সমাজের কিছু অর্ধ শিক্ষিত রুচিশীল মানুষ লেটোগানের প্রতি অনুরাগ বশত শিল্পীদের নিয়ে দল গঠন করে বাইরে বিভিন্ন গ্রামে, অনুষ্ঠানে, মেলায় কিছু রোজগারের জন্য গাইতে যেত। তাদের পালায় বা গানের বিষয় ছিল জমিদারি প্রথা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা অত্যাচার, অনাচার, পুরাণভিত্তিক ইত্যাদি। অভিনয়ের ফলে গ্রামের মানুষরা রাজা, মন্ত্রী, রাজপুত্র, জমিদার প্রভৃতি চরিত্রগুলি সাজার সুযোগ পেয়ে যেত।

সুকুমার সেন একটি লেটো পালায় একটি লেটো গানের পরিচয় দিয়েছেন এবং সেই পালাটি সংগ্রহ করেছিলেন পাঁচুগোপাল রায়। সুকুমার সেন পালাটির নাম দিয়েছিলেন 'বিষম সমস্যা', এটিই ছিল মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত প্রথম লেটো গান, তাই এই গানটির গুরুত্ব অনবদ্য। সেখানে গ্রাম্য লৌকিক জীবনের অন্তরালে দেখানো হয়েছে রাজা, মন্ত্রী, মন্ত্রীর পত্নী, রাজবাড়ী ইত্যাদি বিষয়গুলি। যা তৎকালীন জমিদারি প্রথার বিষয়গুলি সুন্দর ফুটে উঠেছে পালাটির মধ্য দিয়ে। পালায় অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলি রাজা, মন্ত্রী হলেও তাদের সংলাপ যেন গ্রাম্য আঞ্চলিক ভাষাতেই রচিত। তার থেকে বোঝায় যায় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই গ্রাম্য মানুষজন। সুকুমার সেন পালাটির বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে—

পালাটির বিষয় হল এক রাজা মন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন আকাশে কি নাই, তা ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে জানাতে, ব্যর্থ হলে মন্ত্রীর একেবারে প্রাণদণ্ড হবে। মন্ত্রীর সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে মন্ত্রীপত্নি, মন্ত্রী রাজাকে জানিয়ে দিয়েছে, রাজা খুশি হয়েছেন কিন্তু মন্ত্রী নিজেই যে উত্তর দিয়েছে মায়ের পা ছুঁয়ে তা বলতে বলেছেন

রাজা। মন্ত্রী তখন সত্য কোটগ না বলে পারেননি। রাজা তখন জানিয়েছেন তিনি মন্ত্রী পত্নীকে বিবাহ করবেন। মন্ত্রী গৃহে ফিরে পত্নীকে রাজার ইচ্ছার কথা জানাতে পত্নী খুবই প্রীত হয়েছে। মন্ত্রীপত্নি রাজবাড়ী যেতে উদ্যত হলে মন্ত্রী আত্মহননে উদ্যত হয়েছে। ইতিমধ্যে অকুস্থলে রাজা উপস্থিত হয়ে মন্ত্রীকে অর্ধেক রাজত্ব দানের ঘোষণা করলে মন্ত্রীপত্নীকে খেতে ডেকেছে, অভিমানে মন্ত্রী তাতে অস্বীকৃতি, মন্ত্রীপত্নী জানিয়েছেন সে রাজার বাড়ী গিয়ে রাজরানী হত না, শুধু রাজাকে বলত ব্রাহ্মণ কায়স্থরা সাঙ্গা করে না, রাজা যেহেতু হাঁড়ি বাউরি নয়, তাই তাকে সে সাঙ্গা করতে পারে না। মন্ত্রী পত্নীর প্রেমের পরিচয় পেয়ে পুলকিত হয়েছে।[১১]

উক্ত পালাটির মধ্য দিয়ে যেমন একদিকে হাস্য কৌতুকের মিশ্রণ রয়েছে অপরদিকে সমাজের বিশেষ একটি লোকশিক্ষার বিষয়টিও ফুটে উঠেছে এবং পালাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের উল্লেখ আছে যা স্বভাবতই গ্রাম্য সাধারণ সমাজে বসবাসকারী জাতি।

লেটো গান এইভাবে মানবসমাজে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে উনিশ শতকে তা আরও ব্যাপ্তি অর্জন করে সাধারণত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। উনিশ শতকের লেটো গানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় চাচা বজলে করিমের লেটোর দলের কথা। দলটি ছিল বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লেটোরদল। সেই সময়ে বজলে করিমের লেটোর দলের যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি পড়েছিল সমস্ত অঞ্চলে। এমনকি তারা বায়না নিয়ে কোথাও গান গাইতে যেতেন না। তাঁর গানের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠত ধর্মমূলক কাহিনী, দেহতত্ত্ব, আধ্যাত্মবাদ মূলক কাহিনী। যা একাধারে লোকশিক্ষার একটি অঙ্গ ছিল। সমাজের কোনো খারাপ কাজ হলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করত বিভিন্ন উপদেশমূলক গান, অভিনয়, সংলাপের মধ্য দিয়ে এবং হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এই গানের রস আস্বাদন করত। এই লেটো গান যাতে কোনো ভাবেই তার নৈতিকতা না হারায় এবং কোনোভাবেই যেন তা হারিয়ে না যায় তার জন্য প্রাচীনকালের লেটোর দলের সর্দার গাইয়েদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হত। উনিশ বজলে করিমের লেটোর দলের পাশাপাশি ওস্তাদ শেখ চাকর গোদা'র লেটোর দল। দুটি দলের মধ্যে বেশ সুর, তাল, অভিনয়ের লড়াই চলতো। ঠিক এই সময়ে মাত্র আট বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম রোজগারের জন্য তার চাচা অর্থাৎ বজলে করিমের লেটোর দলে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে গান

শিখতে শিখতে এক সময় গান গাওয়া এবং পালায় অভিনয় করা এমনকি বেশকিছু লেটোগান ও লেটো পালা রচনা করে ফেলেন যা বর্তমান কালে খুবই প্রশংসিত। নজরুল সেই দলে থাকতে থাকতে গানের প্রতি এমন শিক্ষা অর্জন করে ফেলেছিলেন এবং বজলে করিমের কাছে একই সঙ্গে আরবি, ফারসি, বাংলা প্রভৃতি ভাষাগুলিতে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে ওঠেন। জানা যায় কিছুদিন পরে গোদার লেটোর দলের জয়জয়কার হতে লাগলে কাজী নজরুল গোদার দলে যোগ দেন এবং অদ্ভূত অদ্ভূত পালা ও গান রচনা করেন যা দেখে চাকর গোদা বলেছেন—'আমার এই ব্যাঙাচি কবি একদিন সাপ হয়ে ছোবল মারবে।'[১২]

লেটো গান বা পালা রচনায় নজরুলেরএত খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর গুরুর প্রেরণা ও ভালোবাসা। কবির গানের প্রতি আগ্রহ, অনুভূতি লক্ষ্য করেই চাকর গোদা কবির সম্পর্কে এই ভবিষ্যত বাণী করেন এবং পরবর্তীকালে গোদার এই কথা কিন্তু বিফলে যায়নি, নজরুল বেশ কয়েকটি লেটো পালা রচনা করেন। দেহতত্ত্ব, প্রেম বিষয়ক, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, সামাজিক ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর লেটো গানও রচনা করেন, যা উনিশ শতকের লেটোর দলিল বলা চলে। উনিশ শতকের অন্যান্য লোকনাট্যগুলির পাশাপাশি লেটো সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেছিল নজরুলের পালাগুলির মধ্য দিয়ে। তিনি যে যে পালাগুলি লিখেছিলেন—'আকবর বাদশা', 'দাতাকর্ন', 'কবি কালিদাস', 'শকুনিবধ', 'মেঘনাদবধ', 'রাজপুত্র', 'চাষার সং', 'ঠগপুরের সং', প্রভৃতি। এই পালাগুলির নাম ও বিষয় বস্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তা পুরাণভিত্তিক, রামায়ণ, মহাভারত কেন্দ্রিক এবং তৎকালীন রাজাদের কাহিনী অবলম্বনে গানগুলি ও পালাগুলি রচিত। নজরুল রচিত 'চাষার সং' নামে একটি তৎকালীন পালার উল্লেখ করা হল—

চাষ কর দেহ জমিতে/ হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি 'উগালে'/ রোজাতে জমি 'সামলে'
কলেমায় জমিতে মই দিলে/ চিন্তা কি হে এই ভবেতে।।
লা ইলাহা ইলাল্লাতে/ বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে/ আর রইবি সুখেতে।
নয়টা নালা আছে তাহার/ ওজুর পানি নিয়াত যাহার,
ফল পাবি নানা প্রকার/ ফসল জন্মিবে তাহাতে।।
যদি ভালো হয় হে জমি/ হজ জাকাত লাগাও তুমি
আরও সুখে থাকবে তুমি/ কয় নজরুল ইসলামেতে।।[১৩]

এই গানটির মধ্যে দিযে কৃষিভিত্তিক মানুষের তথা চাষাশ্রেণির মানুষের চাষ করার পব্বতির কথা বলা হয়েছে এবং গানটি একেবারে কৃষক শ্রেণির মানুষের আঞ্চলিক ভাষা দিয়ে রচিত। তাদের সংলাপ স্তুলি যেন এই গানের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গানটি একপ্রকার খনার বচন জাতীয়। নজরুল ও তার লেটো গানের মধ্যে কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষের কথা বলতে ভোলেন নি। নজরুলের 'শকুনি বধ' পালায় একটি র*-ব্য*, হাসি-কৌতুকে পরিপূর্ণ লেটো গানের পরিচয় পাই—

শিবা হয়ে পরাজিতে প্পরাজ সাধ
জ্ঞান নাই কি তোর কান্ডাকান্ড
হয়েছিস উন্মাদ।
আজা হয়ে জোন সাহসেতে
বধ সাধিস মহাবলীর বাঘের সাথে
ভেদ হয়ে ফনীর সাথে বাধ তুমি বাধ![১৪]

আবার অনেক সময় নজরুল তাঁর লেটো গানস্তুলিতে ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, উর্দু প্রভৃতি ভাষাস্তুলির একত্র মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এমন একটি গানের উল্লেখ করা হল—

ওরে ছড়াদার that পাল্লাদার
মস্ত বডü mad
চেহারাটাও monkey like
দেখতে ভাবিû cad
Monkey লড়বে বাবর কা সাথ
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত,
জানেনা ও, ছোট্ট হলেও
হামভিþ lion cad.[১৫]

উনিশ শতকে নজরুল বেশকিছু লেটো গান ও পালা রচনা করেছিলেন। অন্যান্য লোকনাট্যগুলির চর্চার পাশাপাশি উনিশ শতকে লেটো গানের চর্চা বহুল পরিমানে ছড়িয়ে পড়ে তার একমাত্র কারণ নজরুলের লেটো গান রচনা। এই গানগুলি তৎকালীন সময়ের মানুষজন খুব আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করত।

এইভাবে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা হাস্য কৌতুক জাতীয় এই লেটো গান একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে তার কদর কিন্তু জনমানসে একটুও কমেনি। বিভিন্ন আধুনিক শিল্পীর স্পর্শে তা আরও আধুনিকতার পরিচয় দিচ্ছে বর্তমানে।

লোকসংস্কৃতির কাজই হলো বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সবসময় নতুন নতুন চিন্তাধারা, ভাবধারার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। যুগের গতিতে লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন এ এক নতুন ঘটনা নয় বরং তা বলাই যায় পরিবর্তনশীলতা লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ। মানুষ যেমন যুগের পরিবর্তনে নিজেকে পরিবর্তিত করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিগুলিও পরিবর্তিত। অতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মানুষের জীবনযাত্রার যেমন প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটেছে ফলত একুশ শতকে মানুষের ভাবধারার অনেকখানি পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা বা ভাবধারার যে মূল কেন্দ্রবিন্দু সেখান থেকে তারা কখনই বিচ্ছিন্ন নয়। সেগুলোকেই কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে নিয়েছে মাত্র। লোকসংস্কৃতির এই ধারাটি একুশ শতকের মানবজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকরতে সক্ষম হয়েছে তার পরিবেশন রীতির মধ্য দিয়ে। তৎকালীন সময়ে যে পরিবেশন রীতি ছিল বর্তমান লেটো গানে তাই আছে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন এসেছে। প্রথমেই দেখা যাক তৎকালীন যুগে লেটো অন্ত্যজ শ্রেণি তথা মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে সেই সমাজ ছাড়াও ভদ্র সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে। ভদ্র সমাজের মানুষজনও এখন বর্তমানে লেটোকে সাদরে গ্রহণ করে বেশমনোরঞ্জন করছে। তবে বর্তমানে রাঢ় অঞ্চলের মানিষদের কাছে লেটো 'পঞ্চরস' নামে বেশি পরিচিতি লাভ করেছে এবং লেটোর দল গুলি অপেরা নাম নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের অভিনয়কে। অতীতে লেটো শুধুমাত্র গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু তা গ্রামকে ছাড়িয়ে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন লেটো পালায় নারীর চরিত্রে পুরুষের নারীবেশে অভিনয় ছিল চোখে পড়ার মতো, বর্তমানে লেটো পালায় নারীদের অভিনয় বেশ বিনোদন দিচ্ছে দর্শকসমাজকে। একুশ শতকে নারীরা নিজেদের মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে লেটো পালাগুলিতে। তবে এখন আলাদা ভাবে কোনো লেটোগান গাওয়া হয় না, লেটো পালার মধ্যে থেকে গানগুলিকে সংগ্রহ করে নিতে হয়। আধুনিক শিল্পীদের অভিনয়ে, সাজপোশাকে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। মঞ্চ সজ্জাতেও বেশ আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে, লাইট, মাইক বর্তমান বাদ্যযন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে লেটো পালাতে সংদার বা হাস্য কৌতুকের নায়কের মর্যাদা বর্তমান সময়ে ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর অভিনয়ের গুনেই লেটো পালা আরও মনোরঞ্জনের সুযোগ দিচ্ছে দর্শকদের। তবে বর্তমানের পালাগুলি সময়ের উপযোগী ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গাওয়া হচ্ছে, তৎকালীন ঘটনার

কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না পালাগুলিতে। পালাগুলি বা গানগুলি যথেষ্টই আধুনিক হয়েছে। এখনকার শিল্পীরা বায়না নিয়ে দূর দূরান্তে যাচ্ছে তাদের অভিনয় দেখাতে। প্রধানত শীতের শুরু থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত তাদের অভিনয়ের মোক্ষম সময় এবং এবং রাতের দিকেই লেটো পালাগুলি শুধু হয় যা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। বর্তমানে আধুনিক শিল্পীরা তাদের পালাগানগুলি বা গানগুলি কেউ কেউ লিখে রাখছেন তবে তা অধিকাংশই মৌখিক। পালার মধ্যে হাস্য কৌতুকের যিনি প্রধান তিনিই লেটো পালা বা গানগুলি রচনা করে থাকেন তাই লেটো পালাতে তার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বর্তমান লেটো শিল্পী অধীর মন্ডলের একটি লেটো গানের অংশ তুলে ধরা হল—

বীরভূমের এই সুঁচপুর
নানুর থেকে নয়কো দূর
সেথায় যেতে আর লাগে না বালো রে
ওরা খুঁচিয়ে ১১মানুষ মেলো রে।[১৬]

এই গানটি বীরভূমের ২০০০ সালের একটি বিশেষ ঘটনার সাক্ষী বহন করে চলেছে। বীরভূমের নানুর সংলগ্ন সুঁচপুর গ্রামে গণহত্যার কান্ডটি সেই সময়ের একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় বহন করেছে। তাই বলা যায় লেটো গান সময়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়। অধীর মন্ডলের অপর একটি লেটো গানকে য দি উল্লেখ করা যায় তাহলে দেখা যাবে—

নদীর ধারে জোল জমি চাষ করিস না
বান এলে ধান পাবি না।
বীরভূমের মেয়ের সাথে প্রেম করিস না
মরে গেলে খবর পাবি না।[১৭]

গানটি বীরভূমের কৃষক সম্প্রদায়ের চাষের কথা, বন্যার কথার পাশাপাশি রঙ্গ ব্যঙ্গের ছবিও ফুটে উঠেছে এবং এই গানগুলি লেটো পালাগুলিতে নৃত্যের সহযোগেই গাওয়া হয় ফলে দর্শক মহলে বিনোদনের সীমা থাকে না। এখন সমস্ত মানব সভ্যতা আধুনিকতার স্পর্শে এগিয়ে চলেছে সেখানে লেটো গানগুলিও অত্যন্ত আধুনিক করেই গাওয়া হচ্ছে, সেখানে হিন্দি গান, বিভিন্ন চলচিত্রের গানের মিশ্রণ ঘটেছে আধুনিক শিল্পীদের হাত ধরে।

লেটো গান আধুনিক শিল্পীদের দ্বারা এবং রং বাহারি দুনিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রাচীনকালের অবস্থাকে পিছনে ফেলে অর্থাৎ জমিদার, রাজা, মন্ত্রী এদের যুগ

কাটিয়ে ক্রমশ পরিবর্তিত। তবে আধুনিক লেটো শিল্পীদের বক্তব্য থেকে জানা যায় লেটোগানের চর্চা বর্তমান শতাব্দীতে দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জিত হচ্ছে। তাতে লেটো তার মূল শিকড় থেকে কোনো ভাবেই বিচ্ছিন্ন নয় বরং সে নিজেকে আধুনিক করে নিয়ে শাখা প্রশাখা বিস-তার করতে সক্ষম। লেটোর ভবিষ্যত নিয়ে বর্তমানে শিল্পীদের মধ্যে হতাশার সুর লক্ষ্য করা যায় না কারণ বর্তমানে লেটো দলগুলি অপেরা নাম নিলেও সেই পঞ্চরসের মধ্যেই এক ঘন্টার মতো সময় নিয়ে হাস্য কৌতুক পালা করা হচ্ছে, যা লেটো নামেই পরিচিত। তাই লেটো কোনো ভাবেই লোকসংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি, শিল্পীরা তাকে নতুনভাবে পরিবেশন করছেন। বলাই বাহুল্য লোকসংস্কৃতি বা তার উপাদানগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের চলমানতাকে সঙ্গী করেই চলছে তার নিয়মে।

উল্লেখপঞ্জি :

১। ওয়াকিল আহমদ, বাণলার লোক-সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২, অক্টোবর ১৯৬৫, পৃ-১৩।

২। ধ্রুব দাস, ভারতের লোকনাট্য, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা-৯, রথযাত্রা আষাঢ় ১৩৬৭,পৃ-৯।

৩। সুকান্ত পাল, প্রসঙ্গ : লোকসংগীত, গণমন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৯

৪। ধ্রুব দাস, ভারতের লোকনাট্য, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা-৯, রথযাত্রা আষাঢ় ১৩৬৭,পৃ-১০।

৫। তদেব, পৃ-১১।

৬। সঞ্জীব নাথ, বাংলার লোকনাট্য স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ-৬।

৭। সনৎকুমার মিত্র, বাঙলা গ্রামীন লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ-৮১,।

৮। সুকুমার সেন, নট নাট্য নাটক, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯১৯, পৃ-১২।

৯। সঞ্জীব নাথ, বাংলার লোকনাট্য স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, অপর্ণা বুক

ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৭০০০৩৭, জানুয়ারি ২০০৩,পৃ-৮২।
১০। তদেব। পৃ-৮৩।
১১। বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ-৫২৩।
১২। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেড লিমিটেড, কলিকাতা ১২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০,পৃ-১০।
১৩। অরুণকুমার বসু, নজরুল জীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেড লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, মার্চ ২০১৯, পৃ-১৪।
১৪। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল জীবন ও সৃজন, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১২০৯, জুন ২০১৮,পৃ-১১।
১৫। তদেব। পৃ-১২।
১৬। অধীর মন্ডল, লেটোশিল্পী, দাসকল গ্রাম, বীরভূম, ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত।
১৭। তদেব।